প্রবাহ

গবেষণাধর্মী লিট্‌ল ম্যাগাজিন

বর্ষ ৩২ • সংখ্যা ১ • জুন ২০১৯ • আষাঢ় ১৪২৬

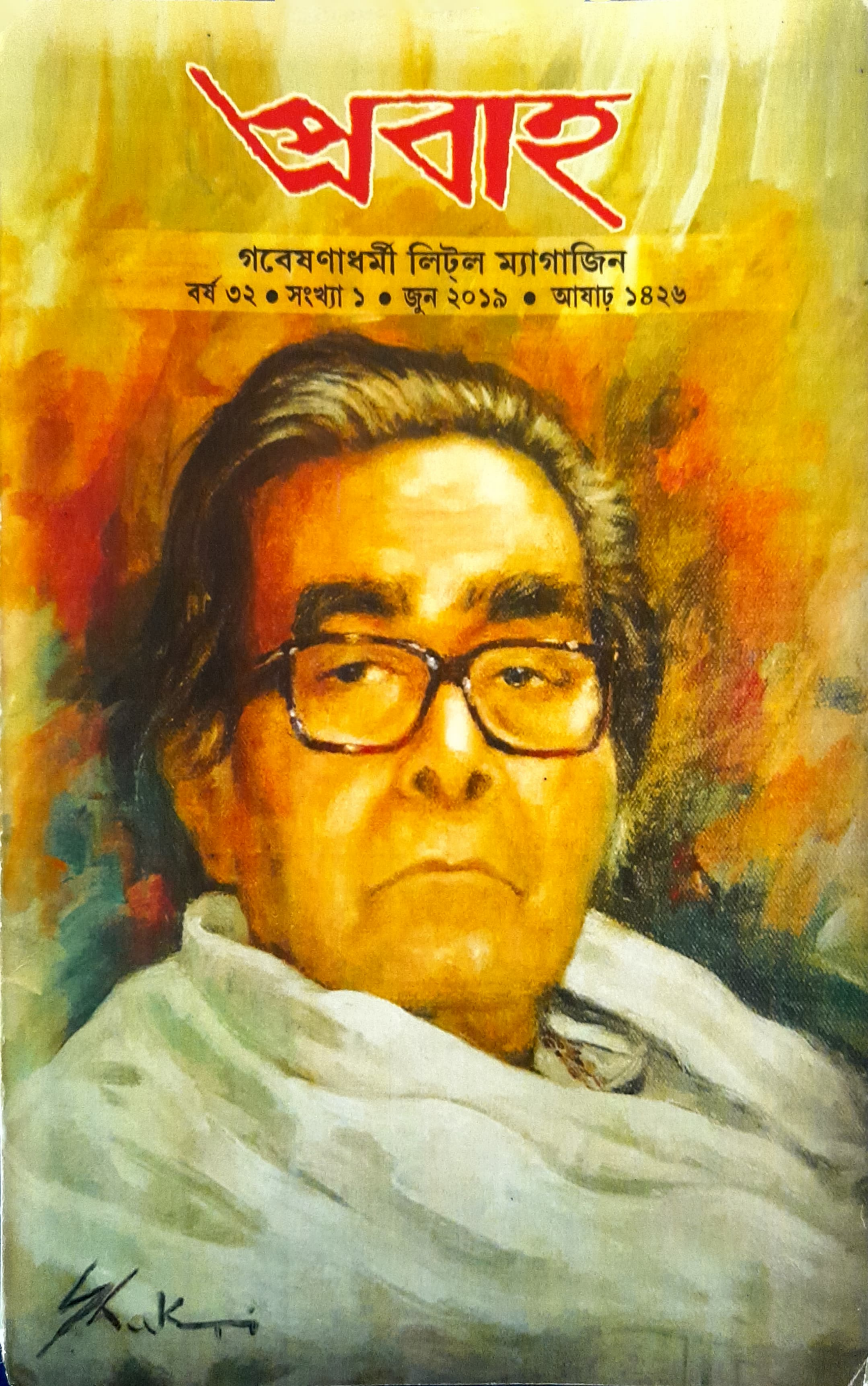

সূচিপত্র

তিনি ব্রজেন্দ্রকুমার • সম্পাদকের কথা • ১
কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ • বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য • ৩
কবিরাজ • শুভাশিস সিনহা • ১৬
কবি, মানুষ ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ • কৃষ্ণামিশ্র ভট্টাচার্য • ২৩
অন্তরঙ্গ আলো : ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ'র কবিতা • তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ • ২৭
ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ'র 'ভিখারি বালকের গান'... • ডঃ পিনাকী দাশ • ৩৩
কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ • অমিতাভ চৌধুরী • ৪৪
আমার স্বামী • সুখদা সিংহ • ৪৭
'এখনও খেলা শেষ হয়নি' • জওহরলাল সেন • ৫০
ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : একটি ইনস্টিটিউশন • প্রদীপ মজুমদার • ৫২
ব্রজেন্দ্রদার 'টোটকা' • উষারঞ্জন ভট্টাচার্য • ৬০
আমি বুক পেতে আছি • সেলিম মুস্তাফা • ৬৩
অনন্ত প্রেমে উদ্ভাসিত কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কবিতা • আশুতোষ দাস • ৭৩
আমার বন্ধু কবি ব্রজেন্দ্র— একটি নিজস্ব চিত্রায়ণ • অরুণশংকর দাশ • ৭৯
ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ • ডঃ অশোক সিংহ • ৮৫
আমার প্রিয় কবি • ঝুমুর পাণ্ডে • ৮৭
সোজা পথ • সমর চক্রবর্তী • ৮৯
ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহর সান্নিধ্যে • বাপ্পি দেবনাথ (নীহার) • ৯১
ব্রজেন্দ্রদার কাছে একটি চিঠি • নন্দকুমার দেববর্মা • ৯৭
পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ এবং সুমধুর ভাষা বাংলা: ব্রজেন্দ্রকুমার : সাক্ষাৎকার • কল্লোল চৌধুরী • ৯৮

ড. পিনাকী দাস

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের 'ভিখারি বালকের গান'

মানবতাবাদের শাশ্বত সুর

১.

এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একেলা পৃথিবী আর
এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি আমি
মাঝখানে শব্দ অর্থ বাকপ্রতিমার এক বিষণ্ণ জগৎ
তাকে কোথায় গোপন করি।

(আমি ও পৃথিবী, ভিখারি বালকের গান)

এই অমোঘ উচ্চারণ বরাক উপত্যকার এক ভিন্নভাষী কবির। কিন্তু বাণীতে কী আসে যায়, কিছু সৃজনশীল সুকুমার শিল্পীরা আপন স্বভাবেই নিরুচ্চার থাকেন, তাঁদের সৃষ্ট সম্পদের প্রকাশের ক্ষেত্রও নিরবয়বভাবে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি যার কবিতার দীপ্তি বিনা আড়ম্বরে প্রকাশ পেয়েছে তিনি আর কেউ নন বরাক উপত্যকা তথা বৃহত্তর বাংলার স্বনামখ্যাত কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ। বরাক- বাংলার এই ভিন্নভাষী কবিকে দেখে নিঃসংশয়ে বলতে পারি- কবির কোনও মাতৃভাষা হয় না। হৃদয়ের ভালোবাসা তথা ভালোলাগাই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে একজন কবির কলমের কালিতে, যেখানে প্রকাশ পায় জীবনের গভীর শান্তিময় স্পর্শ কিংবা অন্তরকে দুমড়ে মোচড়ে ছারখার করা কোন অনুভূতি। সে অনুভূতির হাজার রঙ,

সেই বস্তুকে চিনে নিতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে কবিজীবনের দিকে।

কবিকে তাঁর ব্যক্তিজীবনে খুঁজে নেবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন- 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে' তথাপি আমাদের মনে হয় কবিজীবনের দিকে দৃক্‌পাত না করলে একজন সম্পূর্ন কবিকে জানা যায় না। বিশেষ করে আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে। গত শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকে যাদের জন্ম তারা দেখেছেন বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, দেশবিভাগের মত মর্মান্তিক যন্ত্রণায় হাহাকার করা আর্তনাদ- আর সেই কারণেই ব্যক্তি কবির সঙ্গে কবিতার 'আমি'র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হল। তাই পশ্চাৎপট জানা জরুরি হয়ে যায়। কবিতা তো দর্পণ মাত্র, তার ভেতর কবির অবিরল ছায়া আছে বলেই পাঠক কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি কবির উপলব্ধিজাত চিন্তাচেতনার জগৎকে দেখতে চান।

কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহেরও জন্ম হয়েছিল পরাধীন ভারতে। ১৯৩৮ খ্রি. ১২ ফেব্রুয়ারি কাছাড়ে, বর্তমান বরাক উপত্যকার অদূরে কাবুগঞ্জের পাকইরপার গ্রামে কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের জন্ম হয়। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর পিতা ব্রজলাল সিংহ একজন পুলিশ কর্মচারী ছিলেন। মা নীলমঞ্জুরী দেবী। ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর শিক্ষা-জীবনের সূচনা হয় পাকইরপার গ্রামেরই একটি পাঠশালায়। পিতার চাকরির বদলির সূত্রে কিছুকাল গৌহাটি বেঙ্গলি হাইস্কুলে এবং হাইলাকান্দির সরকারি ভিক্টরি মেমোরিয়েল হাইস্কুলেও পরবর্তী শিক্ষাজীবনের পাঠ গ্রহণ করেন। পিতার এই বদলির চাকরি কবিজীবনের পরম সৌভাগ্য। তিনি নিজেই বলেছেন-

"বাবার এই বদলির কাজ আমার খুব সুখের ছিল। প্রতিবারই নতুন জায়গা, নতুন কৌতূহল, নতুন আকর্ষণ- নিজেকে হারিয়ে যেন আবার নিজেকেই নতুন করে পাওয়া।"[১]

যদিও পুরাতনকে হারানোর ব্যথা থাকত কবিহৃদয়ে তবু মনে হয় নানা জাত, নানা বর্ণ-ধর্মের পাঁচমিশেলি মানুষের সাহচর্যে তিনি মুক্তজীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় মানুষের কথাই বড় হয়ে উঠেছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বাল্যকাল থেকেই পড়ায় মনোযোগী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে হাইলাকান্দির ভিক্টরি মেমোরিয়েল হাইস্কুল থেকেই সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পরীক্ষা চলাকালীন পিতা অসুস্থ ছিলেন, মানসিক অবসাদের মধ্যেই তাঁকে পরীক্ষায় বসতে হয়েছে। তবুও তিনি ভাল রেজাল্ট করেছিলেন- নিশ্চয়ই পিতার আশীর্বাদে তাঁর শিক্ষাজীবনের ক্রমবিস্তার ঘটেছে। একটি কবিতায় পিতৃঋণ স্বীকার করে তিনি বলেছেন-

বাবা আমাকে ছোটবেলায় রঙ চিনিয়ে দিতেন
- এইটে হচ্ছে আতপ চালের রঙ।
বলতেন এই গরমে হাঁড়ির চালও সেদ্ধ হবে।
একদিন সন্ধ্যেবেলায় কী একটা গন্ধ পেয়ে বললেন
- আরে ঠিক যেন গরম ভাতের ঘ্রাণ।
বাবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। চোখে না দেখেও

কত কিছু শিখতে পেরেছি।

(শিক্ষা বিস্তার, ত্রাণশিবির)

শিক্ষা মানুষের বিশ্বাসের জগৎকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কবির নিজস্ব বিশ্বাসের জগৎ আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল তাঁর পিতার সুউপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য। কিন্তু শিক্ষার মানদণ্ড একটু পাল্টে গেলেই, জীবনের মানদণ্ডও যে বদলে যায় এর প্রমাণও পাওয়া যায় কবিতার পরবর্তী স্তবকে। শিক্ষাদানের মাধ্যমের উপরই নির্ভর করে এর প্রসারতা। কবি নিজেই বলেছেন-

"আমি আমার বাবার পথে হেঁটেছি, ছোটবেলায় কত কবিতা, গল্প পড়ে শোনাতেন। বাবা যা বলেছেন ঠিক তাই করেছি বলেই আজ ভালো আছি। 'শিক্ষা বিস্তার' কবিতাটিতে যেমন নিজের কথা বলেছি তেমনি বর্তমান প্রজন্মের কথা বলতে গিয়ে কোথায় যেন বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভব করেছি। কারণ আজকের দিনে হাতের কলম সরে গিয়ে বোমা উঠতে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট হয় না।"[২]

একজন কবি তো সত্যের তপস্যায় রত থাকেন, তাই নিজের শিক্ষাজীবনের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে বর্তমান শিক্ষার রূপও যে কত ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে তা সুস্পষ্ট করেছেন।

১৯৫৬ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শিলচর গুরুচরণ কলেজে আইএ-তে ভর্তি হন। কলেজে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন স্বনামধন্য কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীকে। ১৯৫৮ সালে গুরুচরণ কলেজ থেকেই আইএ এবং ১৯৬১ সালে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের জন্য সে বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৬৩ সালে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সেসময় বেকারদের এতটা হন্যে হয়ে ঘুরতে হত না। ১৯৬৩ সালেই ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ হাইলাকান্দির এস এস কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ তিনদশক অধ্যাপনা করে তিনি ১৯৯৯ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সাময়িক অবসর পেলেও কবির কর্মব্যস্ততা কমে নি, লেখার জগতে ডুবে থেকে অনাবিল আনন্দের সম্ভার তুলে দিচ্ছেন পাঠকের হাতে। বাংলার পাশাপাশি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায়ও অনেক কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন।

২.

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের জীবনের প্রথম ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় ভালোবাসা কবিতা। কবিতা রচনার প্রতি তিনি কবে আকৃষ্ট হয়েছেন জানেন না, হয়তো তার অজান্তেই এক নিবিড় অনুভূতি নীরবে কবিহৃদয়ে লালিত হচ্ছিল, যা পরবর্তীতে বর্ণ ও শব্দের আশ্রয়ে কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন- "লিখতে ভালো লাগে তাই লিখি। হৃদয়ের খাঁচায় যা বন্দি হয়, তাকে মুক্ত করি কবিতার আকাশে উড়িয়ে দিয়ে। এর মানে বোঝানো দায়, তবে আমার কাছে এই মানহীনতার নাম ভালোবাসা।"[৩]

সহজ ভাষায় সরল সত্যের প্রকাশ পাই তাঁর উক্তিতে। সত্যিই তো ভালোবাসাই যেখানে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেখানে অন্য কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। একটু সচেতন হয়ে

মনের দরজা-জানালা খুলে দিলেই আমরাও সেই মুক্ত আকাশের সন্ধান পাব, বুঝে নিতে পারব- কবিতাই ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের জীবন সাধনা। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি আকৃষ্ট হয়েছেন বাল্যবয়সেই কবির জবানিতেই শুনি-

"আমার প্রথম পড়া রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে 'রাজর্ষি'। সেই শৈশবেই বলা যায়। কারণ তখনও আমি কিশোর হইনি। লুকিয়ে পড়তে হত বাইরের বই। আমার শোনা প্রথম রবীন্দ্রসংগীত সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে- 'জানি গো দিন যাবে'। সম্ভবত রেকর্ডের অপর পিঠে ছিল- 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে'। রাজর্ষি থেকেই কোন এক মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাঁর হাত ধরতে চাইলাম- চাইলাম তাঁর দিকে হেঁটে যাই। কৈশোরেই হাতে পেয়ে গেলাম 'সংকলন'। সে আরেক যাদু। রবীন্দ্রগদ্যের জগৎ। তারপর সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই আমার হাতে তুলে দিলেন 'সঞ্চয়িতা'। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আরেক বিস্ময়ের ঘোরে ডুবে গেলাম। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে একটা ছবি যেন মনের মধ্যে দেখতে পেতাম- সামনে একজন লোক হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর অনেক পেছনে আমি। সেই লোকটির জ্যোতির্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত নীলে নীল হয়ে গেছে প্রকৃতি ও আমার হৃদয়।"[৪]

তাঁকে আরো নিগুঢ়ভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি হাইলাকান্দি ভিক্টরি মেমোরিয়েল হাইস্কুলের সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। হাইলাকান্দিতে ছিল কবির মামার বাড়ি। কবি সেখানে থেকেই মাধ্যমিক উর্ত্তীণ হন। সেখানে থেকে পড়ার সুযোগ না পেলে হয়তো পণ্ডিতমশাইয়ের সান্নিধ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন। তিনিই কিশোর ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের বন্ধ মনের দ্বার উন্মুখ করে দিয়েছিলেন সাহিত্য-জগতের দিকে। পণ্ডিতমশাই নানা ধরনের বই তাঁকে পড়তে দিতেন, এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল রবীন্দ্রনাথের বই এবং কবিও রবীন্দ্রসাহিত্যের স্রোতধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এর স্বীকারোক্তি পাই কবির উদ্ধৃতিতে-

"আমার পণ্ডিতমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কৈশোরে মজিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথে। নানা ভাবে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন। ওই পথটাই আমার একমাত্র আশ্রয়"[৫]

রবীন্দ্রনাথ কবিচেতনার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু তা হলেও কবি লেখার কথা কোনদিনই ভাবেননি। কবি যখন গৌহাটি বেঙ্গলি হাইস্কুলে পড়েন, তখন এক সহপাঠীর চাপে পড়েই তাঁকে শব্দ নিয়ে সেলাই-ফোঁড়াই করে কাব্যচর্চার প্রয়াস করতে হয়েছিল। স্মৃতির ঝুলি থেকে নিজের কবিতা লেখার ইতিহাস আমাদের সামনে ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ তুলে ধরেছেন-

"আমার লেখালেখি শুরুর ব্যাপারটা খানিকটা আকস্মিক। আমি যখন গৌহাটি বেঙ্গলি হাইস্কুলে পড়তাম, তখন আমার সহপাঠীদের মধ্যে একটা হাতে লেখা পত্রিকা চালু ছিল। আমার সঙ্গে ঐ পত্রিকার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি লেখক পাঠক কোনটাই নই। হঠাৎই আমার আরেক সহপাঠী এসে আমাকে বললো সে ঐ পত্রিকার জন্য কবিতা লিখতে চায়। তাই আমি কিভাবে লিখি, মানে আমার কবিতার খাতা দেখে শিখতে চায় কিভাবে লিখতে

হয়। বললাম, আমি তো জীবনে কবিতা লিখিনি। আমার কথা সে বিশ্বাস করলো না। তাই বাধ্য হয়ে রাত জেগে দুটো কবিতা লিখতে হলো। আমার সেই আদি কবিতা তার পছন্দ হয়নি। আমার কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে খুবই হতাশ হয়েছিল সেদিন। তারপর বাবা বদলি হয়ে যান। আমরা চলে এলাম মামার বাড়ির গ্রামে। সেখানে একজন ব্যর্থ প্রেমিক তার প্রাক্তন ছাত্রীর উদ্দেশ গান রচনা করে গাইত। আমার মনে হলো ঢের ভালো লিখতে পারি আমি। আমিও নেমে পড়লাম কাব্যরচনায়। আমার কবিতার খাতা যাতে পণ্ডিতমশাইয়ের চোখে পড়ে তার চেষ্টা করতে লাগলাম। তিনি সেই কবিতা স্কুল ম্যাগাজিন 'প্রবাহিণী'-তে প্রকাশ করে দিলেন এবং আমি কবিখ্যাতি লাভ করলাম।"[৬]

হাইলাকান্দি হাইস্কুলের ম্যাগাজিন 'প্রবাহিণী'-তে প্রকাশিত কবির প্রথম কবিতার নামও ছিল 'রবীন্দ্রনাথ'। তখন নবম শ্রেণির ছাত্র। শুরু হয় কবির যাত্রা কবিতা রচনার পথে, কবিতার জগতে কেবলই হাঁটা তাঁর পাথেয়। ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের রচিত কবিতাসম্ভার বাংলা ভাষায় এই 'তৃতীয় ভুবন'-এর কাব্যভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলছে। কবিতা তাঁর কাছে জীবনের মত, যেমন স্বাভাবিক অনাড়ম্বর তাঁর জীবনযাত্রা, তেমনি তার কবিতার মেজাজও সহজ সজীব সচল।

৩.

এ পর্যন্ত কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের দুটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে- 'ভিখারি বালকের গান' (১৯৯৪) ও 'ত্রাণশিবির' (২০০৯)। দীর্ঘদিন কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কোন তাগিদ অনুভব না করলেও, কখনো তাঁর মনের লেখাজোখার কারখানাতে কবিতা ছাপার কাজ বন্ধ হয়ে যায়নি। 'ভিখারি বালকের গান' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন-

"অনেক দিন থেকেই চলছে লেখালেখি। ছাপাও হয়েছে নানান কাগজে,। কিন্তু আমার অসঞ্চয়ী স্বভাবের জন্য আজ অনেক কবিতাই দুষ্প্রাপ্য। এই কারণেই 'দেশ'-এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।"[৭]

কবির জবানি থেকেই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি প্রচারবিমুখ। প্রচারের মোহের শৈবালদামে তিনি নিজের চেতনাকে কখনো আটকে রাখেননি- এক্ষেত্রে তিনি উদাসীন। ভালোবেসে লিখে গেছেন, অসংখ্য কবিতা সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কবিতাগুচ্ছ একসঙ্গে পেতে পাঠককে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল।

'ভিখারি বালকের গান' কাব্যগ্রন্থে মোট ৫৮ টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি পাঠ করলে যে কোন মনোযোগী পাঠক ধরে নিতে পারবেন ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ মূলত প্রেমের কবি। এক ব্যর্থ প্রেমিকের গান তাঁকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করলেও তাঁর কবিতা শুধু প্রেমসিক্ত হয়ে থাকেনি। প্রেমের নীল ধূপ জ্বালিয়ে সেই প্রধূমিতে তিনি যে বাণী প্রচার করেছেন তা বিশ্বপ্রেমের। চিরাচরিত প্রেম ও বিশ্বপ্রেম একাকার হয়ে আছে তাঁর কবিতায়। গভীর উপলব্ধি দিয়ে এ দু'য়ের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন কবি। যার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ, সাধারণ সর্বহারা মানুষের ব্যথার রাগই কবির 'ভিখারি বালকের গান'-এর মূল সুর। কখনো

এর প্রকাশ ঘটেছে রোমান্টিক প্রেমানুভূতির মধ্য দিয়ে কখনো বা বিবাদ বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে। বস্তুত সাধারণের সংকটের কথাই তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। কবি যখন বলেন-

কে তাকে বেসেছে ভালো? তবু চিরকাল
পর্যাপ্ত পুষ্পের মতো মেলে আছে সমগ্র শরীর।
(কে তাকে চিনেছে; ভিখারি বালকের গান)

তখন আপাতভাবে মনে হয়, এ কোন এক অসংসারী উদাসী প্রেমিকের মন-হাহাকার-করা আর্তনাদ কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় উদাসী প্রেমিকের স্মৃতি-তাড়িত রক্ত-পুঁজের অন্তরালে অন্য সমীক্ষা চলছে। বিপন্ন স্বদেশের লাখে লাখে আর্তনাদ করা সাধারণজনের হাহাকার এই জনারণ্যে কে শুনেছে। যারা একটু আলোর জন্য অন্ধকারকে খুঁড়ে মরছে, যারা একটু ভালোবাসার জন্য চিরকাল নিজেদের 'পর্যাপ্ত পুষ্পের মতো মেলে' আছে তবুও কে তাকে চিনেছে।

সাধারণজনের কথাই তাঁর কবিত্বের উৎস ও আধেয়। এই মানবতাবাদের শাশ্বত রূপ দেখি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের 'তোমার সুবাস' কবিতায়। সমুদ্র যেমন দিগন্তে মিশে একাকার ও অন্তরঙ্গ হয়ে থাকে, তেমনি এখানেও কবির ব্যক্তিপ্রেম ও মানবপ্রেম লাভ করে এক নৈকট্যের অনন্যতা। কবিতার প্রথম স্তবকেই দেখি-

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে ওই তোমার সুবাস।
গঞ্জের হাটবারে তিসির দর, গোমড়ক এবং পামরি পোকার মতো
জরুরি বিষয় ভুলে, লোকে বলছে-
কিসের সুগন্ধ এটা মোড়ল মশাই?
যেন বুকের মধ্যে জ্যোৎস্না গিয়ে লাগছে।
কণ্ঠ বেয়ে নামছে যেন তৃষ্ণার জল।

কবির এই 'তুমি' কে? যিনি তার সুবাসে ভাসিয়ে চলেছেন গ্রাম-গ্রামান্তর। আসলে এখানে কবিতার ভাষায় আশ্রয় পেয়েছে নিরাশ্রয়তার কথা। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বদলে যাচ্ছে সমাজ-মানস। জীবনের এই অবমূল্যায়নে সমস্ত গ্লানি, তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা ভুলিয়ে মানুষের হৃদয়কে জ্যোৎস্নায় স্নাত করতে এসেছেন এই 'তুমি'। অন্ধকার তো চোখে নয়, আঁধার ঘর বেঁধেছে মানুষের মনে, সে দূষণে মনুষ্যত্বের অবক্ষয় ঘটে চলেছে। সত্তাবিনাশী আঁধারের বুক চিরে কবির 'তুমি' ভূ- ভারতে আলোর আগমনের বাণী নিয়ে আসেন-

আমি জানি এ তোমার অন্তরঙ্গ আলো।
তুমি জেগে ওঠো প্রেম, জেগে ওঠো। এ আমার অনুরোধ।
গাঁয়ে-গঞ্জে ভূ-ভারতে-এই চরাচরে
অনাহার দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে
তোমার বিশ্বস্ত দৃষ্টি বলে দিক
গমের জাহাজ আসছে ঐশ্বর্যের তটভূমি থেকে।
(তোমার সুবাস; ভিখারি বালকের গান)

মানুষের জীবন যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে, অনাহারে দুর্ভিক্ষে মানুষ যখন একে অপরের শত্রু তখন অনন্ত প্রেমের বাণী নিয়ে আসেন কবির 'তুমি'। তার সুবাসে মানবহৃদয়ে জেগে ওঠে অস্থির নৈরাশ্যময় পরিবেশ থেকে উত্তরণের আকুলতা। মানুষের মরে যাওয়া বিশ্বাস আবার জাগ্রত হয়। 'মৃত্যুর তৃতীয় বিশ্বে' নতুন জীবনবোধ নির্মাণেই কবিপ্রাণ একান্ত হয়ে আছে। বিশ্বপ্রেম তথা মানবপ্রেমের অসীম নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিমূর্ত প্রকাশ দেখি এই কবিতায়।

কঠিন রোগে সমাজ দিশেহারা- সময়ের অন্তর্ঘাতে মানুষ জর্জরিত। সেই কঠিন সময়ের বেসুরো রূপ যে গ্রাম্যজীবনের উপরও পড়েছে বিবেকি কবি সেদিকেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন-

উদলা চাঁদ উঠে আসে হাঞ্জাবেলা
পিরথিমি মায়ের অঙ্গে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।
বিয়ান বেলার রৌদ্র একদিন হাততালি দিয়ে
মায়ের শুকান বুকে উথাল পাথাল
পিতলে চুড়ি হইয়া ঝিকমিক করেগো নদী
লিলুয়া বাতাসে
চিত সুখে গীত গেয়ে যায়। কলিঞ্জায় গুন গুন ভোমরা
সারাদিন দোতারা বাজায়।

(কিস্‌সা কাহিনী; ভিখারি বালকের গান)

গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে কবির নাড়ীর টান। তাই অলক্ষ্যে কবিতাটির সর্বাঙ্গে অবধারিতভাবে ছেয়ে আছে উপত্যকার লোকায়ত মেজাজ ও অনুষঙ্গ। আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগে বুঝে নেই প্রাক্তন গ্রাম্যজীবনের ঘ্রাণ কবিকে ছাড়েনি। 'উদলা চাঁদ', 'হাঞ্জাবেলা', 'বিয়ান', 'কলিঞ্জা' এসব আঞ্চলিক শব্দের সুনিপুণ ব্যবহারের মধ্য দিয়েও তিনি গ্রামীণ দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে সক্ষম। পৃথিবীর যাবতীয় নিষ্ঠুরতা হার মানে মায়ের মমতার কাছে। মাতৃহৃদয়ে সন্তানের প্রতি যে অসীম স্নেহ পুঞ্জিভূত থাকে- সেই বাণী তার কবিতার বচনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সন্তানের জন্য মায়ের অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহেও স্নেহের বান ডাকে- 'মায়ের শুকান বুকে উথাল পাথাল' এই পংক্তি মনে করিয়ে দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' কিংবা অরুণ মিত্রের বিখ্যাত পংক্তি- মেয়েরা স্তনের ডৌলে গরীব মমতা নিয়ে বসে পড়ে'। ভাঙা নয়, শুধু গড়ার স্বপ্ন কবির চোখে। তাই এত অনিশ্চয়তার মধ্যেও কবির কামনা আলোকিত জগতের-

কলিঞ্জায় ভোমরা মরে। শুকায় ঝিঙ্গার ফুল।
দোতারা বাজাও তবু-
ভাঙ্গাটুটা চাঁদ আজ শেষবার উঠিয়া আসুক।

(কিস্‌সা কাহিনী; ভিখারি বালকের গান)

কবির এই উচ্চারণ সমগ্র কবিতাকে অসামান্য উদ্ভাসে ভরিয়ে তোলে। অভিশাপদীর্ণ মানবসমাজ নিমগ্ন হচ্ছে হতাশার বিবরে, সেই ক্লেদাক্ত পরিস্থিতিতে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় মানব-জীবনের গান। সে গান সৃষ্টির, আর এ সৃষ্টির দায় নিতে হবে মানবজাতিকেই।

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কবিতার পরতে পরতে রয়েছে মানুষের প্রতি দরদ, অবহেলিতদের জন্য কাতরতা। বর্তমান সময়ের মানুষ মূল্যবোধ হারিয়ে ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। অন্তঃসারশূন্য সে সময়ের ছাপ তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট। কবি সত্যদ্রষ্টা- যা দেখেছেন তাই কবির কণ্ঠস্বরে মুখর হয়ে উঠেছে। কবি অরুণ মিত্র তাঁর 'কবিতা, আমি ও আমরা' গ্রন্থে বলেছিলেন-

"...জীবনের যে পরিবেশে কবির অস্তিত্ব, সমকালের যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন, সেই পরিবেশ এবং সেই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে তাঁর রচনার প্রকরণে পদ্ধতিতে।"[৮]

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ ফেলেছে তাঁর কবিতায়। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দেশবিভাগ-আণবিক শক্তি ও ঔপনিবেশিক শোষণের ছোবলে মানবিক অস্তিত্ব সংকটাকীর্ণ, মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এই দুর্মর যন্ত্রণার অবসান ঘটবে মানুষের হাতেই। কবির বিশ্বাস মানবিক সম্ভাবনা ও দায়িত্বচেতনায় এই পীড়িত-লাঞ্ছিত-অবহেলিত মানুষের দলই এগিয়ে অসবে রুগ্‌ণ সমাজের শুশ্রুষার জন্য। কবি মানবজাতিকে আহ্বান করে বলেন-

খেতের মানুষগুলোকে ডেকে বললাম, ভাইসব, মানুষের খেত লাগাও।
এই সব বৃষ্টি আলো হাওয়া বাতাসের সবটাই তাৎপর্যবিহীনভাবে ভেসে যাবে।
(অনর্থক; ভিখারি বালকের গান)

সংগ্রামের অবসানের জন্য কবি দীনেশ দাসও সবুজ বিপ্লবের কথা বলেছেন 'কাস্তে' কবিতায়। তাঁর কাছে লৌহ-ইস্পাতের যুগ শেষ হয়ে যায় মাটির কাছে। দীনেশ দাসের কাছে ছিল 'মাটির যুগ ঊর্ধ্বে' আর ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের নিকট 'মানুষের যুগ ঊর্ধ্বে'। শতাব্দীর অভিশাপ থেকে উত্তরণের জন্য দুই কবিসত্তাই প্রাধান্য দিয়েছেন মানবতাবাদকে। 'গরিবের দেশ'কে রক্ষা করার সাহস ও শক্তি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কেননা 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বাকি সমস্তই মিথ্যা। কবির বিশ্বাস প্রকৃত মানুষই এই কুকড়ে যাওয়া স্থবির পৃথিবীতে আলো নিয়ে আসবে।

আলো আসার স্বপ্নই জেগে থাকে ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের অন্তর জুড়ে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অনিশ্চিত প্রতীক্ষায়ও কবির চোখে ক্লান্তি আসে না। বলেন-

আলোক আসবে বলেছিল, সে তো আজ এখনও এল না,
ভরা কোটালের বান, কুয়াশার সাদা চাদর জড়ানো
নিসর্গের মুখর সবুজে।

তাঁর প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনাও অসাধারণ, কিন্তু এই প্রকৃতির শরীর ফ্যাকাসে হয়ে আছে কারণ কবি এই প্রকৃতির বুকেও আলোর অভাব উপলব্ধি করেন। কবি যখন বলেন 'চৈতন্য জুড়ে আলোক এলো না' তখন বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, জং-ধরা আমাদের

চেতনায় আর কোন কিছুই সাড়া জাগাতে পারে না। তাই 'রোদ্দুর' অর্থাৎ সূর্যকিরণও কবির বাসি কাপড়ের মত বলে মনে হয়েছে। অধ্যাপক পৃথ্বীশ দেশমুখ্য এ সম্পর্কে বলেছেন-

"শীতের সকালে অফিসের বাবুদের মতো ব্যস্ত সূর্য, যে বাসি কাপড়ের মতো রোদ্দুর ছড়িয়ে গেল- তার সৌন্দর্য দেখেও কবির চৈতন্যে আলোক আসে না। সে বোধ হয় আর আসবে না। তাই কবির অন্তর জুড়ে শুধুই অন্ধকার।"[৯]

অচেতন মানুষের স্থবির জগতে তো কবিরও বাস, তিনি দেখেছেন মানুষ নামের খোলসের ভেতর ফাঁকা, যেখানে নেই আবেগ, নেই উদ্বেগ- মানুষ এখন শুধুমাত্র হাড় ও মাংসের স্তূপ- আর এই স্তূপাকৃতি কবির মর্মকোষে জন্ম দেয় বিষণ্ণতার- হতাশার। হতাশা থেকে কবিহৃদয়ের অতলান্তে জেগে ওঠে এক ধিক্কারবোধ। ধিক্কার সমাজের সত্তাহীন মানুষের প্রতি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেন এক অলসতা বিরাজ করছে, নিরুদ্বেগ স্পন্দনহীন তাদের চলাফেরা। এই আধমরা মানুষগুলিকে দেখে বেদনার্ত ব্যঙ্গের স্বরেই কবি বলেন-

খুবই রহস্যজনক ব্যাপার
আমার কাঁধে একটা মড়া- অর্থাৎ আমারই মৃতদেহ
বয়ে বেড়াচ্ছি আমি।

(আয়না; ভিখারি বালকের গান)

আধমরা মানুষের ভিড় থেকে কবি বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না বলে নিজেকেও জীবন্ত-শব মনে করেন। পলায়নপর মানুষের দল পরিস্থিতির পোষ মেনে নিয়েছে। প্রতিবাদহীন এদের ভাবনাবিশ্ব। জীবন ও চেতনার প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে ব্যর্থ এই মানুষেরা কেমন ঝিম ধরে আছে- হয়তো নিজেকেও ওরা আর চেনে না। কবি এই নির্জীব মানুষের উদ্দেশে বলেছেন-

মানুষের মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না।
আমিও নিজের মুখ দেখে নিজেকে চিনি না।
এই মড়াটাই আমার আয়না। (ঐ)

দায়িত্ব-চেতনাহীন সমাজের প্রতি ব্যঙ্গবাণই কবির দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত, নিঃসঙ্গতাদীর্ণ অস্থির সমাজ-পরিবেশে দাঁড়িয়ে আশাবাদী কবি বার বার মানুষ হওয়ার বীজমন্ত্রটিই জপ করে চলেছেন। এই বীজমন্ত্রের মাধ্যমেই তিনি মানুষের চৈতন্য-সম্পাদন করতে চান। ত্রিশের দশকে পরাধীন ভারতে কবির জন্ম। দেখেছেন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। স্বাধীনতা এসেছে, তবে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ভঙ্গুরতা-দুরাশা। স্বাধীনতার সংলগ্ন আগে-পরে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে এসেছে আশাভঙ্গ ও স্বপ্নবিনাশের যুগ। সেই রক্তক্ষয়ী ঝাঁঝালো সুরের রেশ এখনও থেকে গেছে। তখন থেকেই মানুষ যেন পিশাচ হয়ে উঠেছে, সামান্য স্বার্থের জন্য একে অপরকে শোষণ করছে। দেশের হতভাগা মানুষদের অসহায়তায় কবিহৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ। এই দহনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'শ্বেতপাথরের পরির কাছে মানত' কবিতায়-

তুমি অনেকদিন বাবুর বাগান আলো করে আছ।

ছেলেবেলার দুর্গাঠাকুরের চেয়েও তুমি
নিষ্ঠুর এবং সুন্দর। অর্থাৎ নিষ্ঠুর সুন্দর।
তোমার স্মিতহাস্যময় শৈশব কিশোর
দুঃখিত জ্যোৎস্নার মতো
চেয়ে থাকত ইস্কুলের পথ।

(শ্বেতপাথরের পরির কাছে মানত; ঐ)

'বাবুদের বাগানে শ্বেতপাথরের পরিকে অবলম্বন করে কবির বিভিন্ন বয়সের চিন্তাধারা বাণীরূপ লাভ করেছে ঠিকই, সেইসঙ্গে কবির চিত্তজগৎকে বিমথিত করা ছিন্নমূল প্রাণের যন্ত্রণাও মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটি পাঠ করতে মনে হয়, কবিতার 'তুমি' হচ্ছেন 'দেশজননী', যিনি আঘাত সহ্য করে করে 'নিষ্ঠুর' হয়ে গেছেন, তার হৃদয় নেই। আর 'বাবুর বাগান'কে ভারতবর্ষ বললে ভুল হবে না। এই ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবিতার তৃতীয় স্তবকে-

শরিকি ভাগ-বাটোয়ারা এবং মামলা-মোকদ্দমায়
নিঃস্ব হয়েছে ওয়ারিশরা। (ঐ)

ভারতবাসীরা আজ নিঃস্ব—নিজেদের দেশকেই ভাগ করে নির্বিকারচিত্তে বসে আছে। কবি উপলব্ধি করেছেন নিষ্ঠুর জননী তার সন্তানদের আশীর্বাদ না করলে তাদের যন্ত্রণার অবসান নেই। তার সব অভিমান ভুলে কবি তাকে মানবসন্তানের পাশে এসে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন, তবেই লাঞ্ছিতরা প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। কবির প্রার্থনা-

তোমার পায়ের কাছে ফুল বেলপাতা এবং
একটা সিকি মানত করলাম
তুমি মানুষ হও। (ঐ)

সমাজের অমল বিশ্বাসের গাছে মানবতাবাদের ফুল হোক, সেই ফুল পুষ্ট হোক ফলে— এই কামনাই কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কবিতায় সুশোভিত হয়ে উঠেছে। দেশকে গড়ে তুলতে পারে মানব-সমাজ। কাজেই প্রথমে মানুষদের বাঁচাতে হবে, তবেই না দেশ রক্ষা পাবে। মানবজাতিই তো দেশকে অপচয় থেকে উপচয়ের দিকে নিয়ে যাবে। এখানে মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মানসীর চারণী দলের সেই গান-

"কিসের শোক করিস ভাই- 'আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই- 'আবার তোরা মানুষ হ'।।"[১০]

তবুও আত্মা অতৃপ্ত। বিষণ্ণ হৃদয়ে তিনি দেখেন আকালের দেশে অন্নপূর্ণার আলো মরে যায়। অন্ধকারের বলয়গ্রাস থেকে মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। এমন প্রতিকূলতায় মানুষের জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। মানুষ ভীত, কবিও আশঙ্কিত-সংকুচিত স্বদেশভূমি। স্বদেশের বিবর্ণ ছবি পাই ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের কবিতায়-

আহা আমার ত্রিপাদভূমি, আহত স্বদেশ লুণ্ঠিত প্রতিমা হয়ে পড়ে থাকে
সুদীর্ঘ বিস্তৃত হাত বুক থেকে, মায়াবী শরীর থেকে

ঝুলে আছে আশ্রয়বিহীন
হিরণ্ময় স্বপ্নিল বিকেল রক্তে মাখামাখি সন্ধ্যা নামে
ধোঁয়া ও আগুনে।
আহা আমার স্বদেশ পোড়ে
তার স্তন উরুতে আগুন।

(যাও পাখি, ঐ)

চারদিকে বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখা। এই 'লুণ্ঠিত প্রতিমা'র সন্তানরাও ক্রমাগত হেঁটে চলেছে অনিশ্চয়তার দিকে। কবি চান না এই শূন্যতা, তিনি জানেন, মানুষ অন্ধের মতো যাকে এড়িয়ে গিয়ে নির্বিবাদে বাস করতে চাইছে তার দায় নিতে হবে মানবজাতিকেই। ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ আশাবাদী কবি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস মনুষ্যত্ব এখনো সম্পূর্ণ মরে যায়নি। এই অন্ধকারের গহ্বর থেকেই বেরিয়ে আসবে একদল মানুষ, যারা পৃথিবীতে আলোর সন্ধান দিয়ে যাবে। সে আলোয় প্রচারিত হবে শর্তহীন ভালোবাসার গান, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। নব সৃজনকারী সেই মানুষদলের প্রতি কবির উচ্চারণ-

জ্যোৎস্না এখনও মরেনি। খুঁজে নাও। (জ্যোৎস্না;ঐ)

কবি ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের বাসনা পূর্ণতা পাবার আশায় সমর্পিত হল বর্তমান প্রজন্মের হাতে। বিশ্বাস, কবির ওজস্বী উচ্চারণে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে বর্তমান প্রজন্ম। তবেই ঋদ্ধ হবে জনজীবন, ঋদ্ধ হবে মনুষ্যত্ব।

সূত্রনির্দেশ :

১. ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : সাক্ষাৎকার পিনাকী দাস।
২. ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : ঐ।
৩. ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : ঐ।
৪. ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : 'আমার রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্য ১৩৮, ১ শ্রাবণ ১৪১৭।
৫. ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : ঐ।
৬. পৃথ্বীশ দেশমুখ্য : 'ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ', আধুনিক বাংলা কাব্যে বরাকের ভিন্নভাষী কবি, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৬।
৭. ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ : 'ভূমিকা', ভিখারি বালকের গান, অক্ষর পাবলিকেশন্‌স, আগরতলা, ১৯৯৪।
৮. অরুণ মিত্র : 'কবিতা, আমি ও আমরা'।
৯. পৃথ্বীশ দেশমুখ্য : 'ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ', আধুনিক বাংলা কাব্যে বরাকের ভিন্নভাষী কবি, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৬।
১০. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 'মেবার পতন'।

ড° পিনাকী দাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জনতা কলেজ, কাবুগঞ্জ, কাছাড়, আসাম।